সিজোফ্রেনিয়া

সিজোফ্রেনিয়া একটি অন্যতম মানসিক সমস্যা। যাদের সিজোফ্রেনিয়া আছে তাদের সাথে সাথে তাদের পরিবারের সদস্য এবং পরিচিতরাও সমস্যায় পড়ে যান কারণ রোগীরা প্রায়ই অদ্ভূত আচরণ করেন। ফলে তাদের সাথে মানিয়ে চলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সিজোফ্রেনিয়া হলে কিভাবে বোঝা যাবে?

কারো সিজোফ্রেনিয়া হয়েছে কিনা তা সঠিক ভাবে বলতে পারেন একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ বা সাইকিয়াট্রিস্ট। পরিবারের সদস্যরা অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পারেন যে, ব্যক্তির আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় কিছু পরিবর্তন এসেছে। সিজোফ্রেনিয়া হলে ব্যাক্তির মনে কিছু বিচিত্র লক্ষণ দেখা যায়। লক্ষণের দিক থেকে বিভিন্ন জনের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। অর্থাৎ সবার মধ্যে সব লক্ষণ নাও থাকতে পারে। আবার একজনের লক্ষণের ধরণ থেকে আরেকজনের লক্ষণের ধরণ আলাদা হতে পারে। নীচে কতগুলো লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১. রোগীর মধ্যে এমন ধরণের বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই, কোন যুক্তি এই বিশ্বাসকে সমর্থন করেনা এবং এই বিশ্বাস ব্যক্তির সমাজ বা শিক্ষাগত স্তরের বিশ্বাসগুলোর সাথে মিলেনা। তার মধ্যে এই অযৌক্তিক বিশ্বাসগুলো খুবই দৃঢ় হয়। যেমন, কেউ যদি বিশ্বাস করেন যে, তিনি স্বয়ং শয়তান এবং তার অনেক ক্ষমতা আছে যা দিয়ে তিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারেন তবে তা মানসিক রোগ বলে বিবেচিত হবে। কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেয়া হলো।

   - উপযুক্ত কারণ ছাড়াই একজন বিশ্বাস করেন যে, অন্য লোকেরা, এমনকি তাঁর নিজের বাবা-মা, স্বামী বা স্ত্রী বা কোন প্রতিষ্ঠান (যেমন, পুলিশ) তার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, তাকে পাগল বানাতে চেষ্টা করছে বা তাকে বিষ খাওয়াতে চাচ্ছে।
   - কোন সম্পর্ক নেই এমন বস্তু, ঘটনা বা মানুষের সাথে তার নিজের একটি সম্পর্ক

আছে রোগী এমনটা বিশ্বাস করেন। যেমন, পত্রিকাতে কোন কিছু লেখা হলে মনে করেন যে, এটি তার বিষয়েই হয়েছে। রেডিওতে কোন আলোচনা করা হলে তিনি মনে করেন যে, এটি তার বিষয়েই হচ্ছে। রাস্তা দিয়ে মানুষ কথা বলতে বলতে গেলে মনে করেন যে তারা তার বিষয়েই কথা বলছে।

- রোগী নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে পারেন। তিনি নিজেকে বিরাট ধনী, আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রাপ্ত বা অতি মহান ব্যক্তি ইত্যাদি মনে করতে পারেন।
- রোগীর মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত কতগুলো ভুল বিশ্বাস জন্মে। যেমন, কেউ নিজেকে সৃষ্টিকর্তার পাঠানো মহাপুরুষ ভাবতে পারেন। তিনি দাবী করতে পারে যে, সৃষ্টিকর্তার সাথে তার সরাসরি যোগাযোগ আছে।
- কেউ তার স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি তীব্র সন্দেহে ভুগতে পারেন। তিনি স্ত্রী বা স্বামীর কাপড়ে অবৈধ সম্পর্কের প্রমাণ খোঁজেন। স্ত্রীর/ স্বামীর ব্যাগ বা বাক্সে প্রেমের চিঠি খোঁজেন। স্বামী/স্ত্রীর চরিত্রের সততার প্রমাণ পেলেও তারা সন্তুষ্ট হননা। কিন্তু যদি চরিত্রহীনতার কোন বাস্তব প্রমাণ থাকে তবে কিন্তু এরকম সন্দেহকে ভুল বিশ্বাস বা মানসিক রোগের লক্ষণ বলা যাবেনা।

২. তিনি এমন কিছু অবাস্তব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন যাতে তিনি চোখ, কান, নাক, জিহ্বা বা ত্বক এই পাঁচটি ইন্দ্রীয়ের কোনটি দিয়ে কোন বাস্তব অনুভূতি না পাওয়া সত্বেও তার মনে হয় তিনি এগুলোর সাহায্যে বাস্তব অনুভূতি পাচ্ছেন। এই অনুভূতিগুলো এমন তীব্র হয় যে তিনি এগুলো কল্পনা বলে মনে করেননা। পরিবেশের বিভিন্ন বিষয় বা নিজের দেহের বিভিন্ন অনুভূতির বিষয় নিয়েও এই অনুভূতিগুলো হয়। কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেয়া হলোঃ

- ব্যাক্তি কোন শব্দ, গান বা কথা শুনতে পান, কিন্তু তার সাথেরই অন্যরা এমনটা শুনতে পাননা। এই ধরণের অবাস্তব গায়েবী আওয়াজ পরিষ্কার ভাবে শোনা যেতে পারে বা অস্পষ্ট ভাবেও শোনা যেতে পারে। কতগুলো শব্দ বা প্রবাদ বাক্য বা বাক্য বলা হচ্ছে এমনটা শুনতে পারেন। এগুলো সরাসরি তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হতে পারে বা তার বিষয়ে দুই বা

ততোধিক কণ্ঠ আলাপ করছেন এমনটাও হতে পারে। কোন কোন সময় এই গায়েবী আওয়াজ কিছু সময় পরই তিনি কি চিন্তা করবেন তা আগেই বলে দেয়। তিনি কিছু চিন্তা করার পর পরই অদৃশ্য কেউ চিন্তাটি উচ্চারণ করে দেন। তিনি এই শব্দ বা কথাগুলো বাস্তব মনে করেন। কিন্ড়অন্যরা কিছুই শোনেননা এবং এগুলোকে অবাস্তব বলে মনে করেন।

- তিনি কতগুলো অবাস্তব দৃশ্য দেখেন, কিন্তু এগুলোকে বাস্তব মনে করেন। তিনি যে অবাস্তব দৃশ্য দেখেছেন তার আকৃতি সাধারণ দৃশ্যের চেয়ে ছোট হতে পারে। তিনি হয়তো কোন বিরাট টেলিভিশন স্ক্রীনে কতগুলো দৃশ্য দেখেন, কিন্তু আশে পাশের কেউ এমনটা দেখতে পাচ্ছেননা। ব্যক্তি এমন দৃশ্য দেখতে পারেন যা শুধু খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। যেমন, তিনি নিজের মাথার ভিতরের কোন দৃশ্য দেখতে পারেন।
- তিনি কোন গন্ধ, সচরাচর বাজে গন্ধ পেতে পারেন বা কোন স্বাদ পেতে পারেন (যদিও সেখানে কোন বাস্তব স্বাদ বা গন্ধ নেই)।
- কোন বাস্তব স্পর্শ ছাড়াই তিনি অনুভব করতে পারেন যে, কেউ তাকে স্পর্শ করছে। তাঁর শরীরের খোঁচা লাগার অনুভূতিও হতে পারে। গলা টিপে ধরলে যে রকম শ্বাস রোধ হয়ে আসে, তিনি সে রকম অনুভূতিও পেতে পারেন। তিনি অনুভব করতে পারেন যে, চামড়ার ঠিক নিচে দেহের ভিতরে পোকা, কেঁচো, ক্রিমি বা পিপড়া বা অন্য কোন ধরণের ছোট পোকা নড়াচড়া করছে। তারা মাংসের গর্তে লুকিয়ে আছে।
- তিনি অনুভব করতে পারেন যে, তার দেহের ভেতরের অঙ্গগুলো (যেমন, পাকস্থলি, অন্ত্র, ফুসফুস, হৃৎপিন্ড ইত্যাদি) টেনে লম্বা করা হচ্ছে বা ফুলানো হচ্ছে। যৌন উদ্দীপনা বা বৈদ্যুতিক শক্ এর অনুভূতিও তিনি পেতে পারেন। নিজের চোখের সামনে নিজের দেহের ছবি অল্প সময়ের জন্য ভেসে উঠতে দেখার অভিজ্ঞতাও তিনি পেতে পারেন। এর ফলে মনে করেন যে, হুবহু তার মতো দেখতে অন্য আরেকজন মানুষ আছেন।

৩. সিজোফ্রেনিয়া যাদের হয় তাদের ভাষার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়। তারা ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন কথা বলতে পারেন। তারা ক্রমাগত অসঙ্গতিপূর্ণ কথা বলতে পারেন। অর্থাৎ তাদের কথা ঠিকমতো

বোঝা যায়না।

৪. তাদের আচরণের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়। তারা অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করেন। তাদের ভাষা, আচরণ সবই অসঙ্গতিপূর্ণ হয়। তাদের আচরণ স্বাভাবিক থাকেনা। তারা কখনো একেবারে চুপচাপ থাকেন, এসময়ে তাদের দেহ একদম নড়েনা। আবার কখনো তারা অতিরিক্ত নড়াচড়া করেন বা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারেন। অনেক সময় তারা চরম নেতিবাচক হন, তাদের ভাবভঙ্গি অদ্ভূত হয়, সব আচরণই একটা নিয়ম মেনে করেন, নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দেন না, অনেক সময় মুখ ভ্যঙচান। আবার অন্যের চাল-চলন বা কথাবার্তা হুবহু নকল করেন।

৫. এগুলো ছাড়াও আরো কিছু লক্ষণ দেখা যেতে পারে। যেমন,

- তাদের মুখে কোন ভাবের প্রকাশ থাকেনা। সাধারণভাবে মানুষ যতটা নড়াচড়া করেন তারা তার চেয়ে অনেক কম নড়াচড়া করেন, কথা বলার সময় হাত বা মাথা নেড়ে তারা ভাবের প্রকাশ করেননা। অন্য মানুষের চোখের দিকে কম তাকান, তাদের সুখ-দুঃখের ঠিক থাকেনা। যেমন, হাসির সময় না হেসে কেঁদে ফেলতে পারেন, আবার দুঃখের খবরে হেসে ফেলতে পারেন। কথাবার্তার সময়ে প্রায়ই তাদের গলার স্বরের স্বাভাবিক উঠানামা থাকেনা।

- তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে অল্প কথায় উত্তর দেন, দরকার হলেও তারা তাদের কথার অর্থ বুঝিয়ে দেননা। অনেক সময় তারা বেশী কথা বলেন। অনেক সময় তারা বেশী কথা বললেও তার মধ্যে সারবস্তু থাকেনা। অনেক সময় তাদের চিন্তা বাধাগ্রস্থ হয় এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে দীর্ঘ সময় নেন।

- তাদের পোশাক-আশাক এবং তারা নিজেরাও অপরিষ্কার থাকেন। তারা চাকুরী, স্কুল বা ঘরের কাজ করতে পারেননা। অনেক সময় তারা দীর্ঘ সময় নড়া-চড়া না করে চুপ করে বসে থাকেন।

- তারা কোন কাজেই উৎসাহ পাননা। অনেকের যৌন আগ্রহ এবং তৎপরতা কমে যায় বা তারা যৌন আনন্দ পাননা। অন্য কারো সাথে বিশেষ করে বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখতে পারেননা। তাদের বন্ধু-বান্ধব কম

থাকে বা একেবারেই থাকেনা। তারা একা একা থাকতে চান।

- তারা সামাজিক কাজ-কর্মে আগ্রহ পাননা। তাদের অংক করতে সমস্যা হয়।

সিজোফ্রেনিয়া কেন হয়? বিভিন্ন কারণে একজন মানুষের সিজোফ্রেনিয়া হতে পারে। একেক ব্যাক্তির ক্ষেত্রে একেক কারণ বেশি কাজ করতে পারে। আবার কতগুলো কারণ একসাথেও কাজ করতে পারে। নিচে সংক্ষেপে কারণ গুলো নিয়ে আলোচনা করা হলোঃ

১. বংশে কারো থাকলে বংশধরদের মধ্যে এ রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বাবা-মা দু'জনের মধ্যে যে কোন একজনের এরোগ থাকলে সন্তানের এরোগ হবার সম্ভাবনা ১৭%, আর যদি উভয়েরই এইরোগ থাকে তবে সন্তানের এরোগ হবার সম্ভাবনা প্রায় ৪৬% থাকে।

২. মস্তিষ্কে এক ধরণের রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণের ত্রুটির ফলে মস্তিষ্কের নিউরোকেমিক্যাল উপাদানের ভারসাম্যহীনতা হলে এ রোগ হয়।

৩. জন্মকালীন কোন জটিলতা থাকলে এরোগ হবার সম্ভাবনা থাকে।

৪. সমাজে বঞ্চিত পরিবারে স্কিজোফ্রেনিয়া বেশি দেখা যায়।

৫. অন্য দেশে গিয়ে বসবাসকারী পরিবারগুলোতে এরোগ বেশি দেখা যায়।

৬. অবিবাহিত, একাকী এবং কম বন্ধু-বান্ধবযুক্ত মানুষদের মধ্যে স্কিজোফ্রেনিয়া বেশি দেখা যায়।

৭. গর্ভকালীন সময়ে মা ইনফ্লুয়েঞ্জা বা রুবেলা আক্রান্ত হলে ঐ শিশুর পরবর্তী জীবনে এরোগ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

৮. জীবনে দুঃখজনক কোন ঘটনা ঘটলে (যেমন, আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেলে, প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটলে, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে ইত্যাদি) তবে ঐ ঘটনার পর পর এরোগ হবার সম্ভাবনা দ্বিগুণ হয়ে যায়।

আরো কতগুলো বিষয় আছে যেগুলো সরাসরি সিজোফ্রেনিয়ার কারণ না হলেও এগুলো রোগটাকে ত্বরান্বিত করে। যেমন, যদি পরিবারে খুব বেশি সমালোচনা, শত্রুতা এবং আবেগ প্রবণতা থাকে তবে সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের মধ্যে যাদের রোগটি সেরে গিয়েছিল তাদের আবার এরোগটি হবার

সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া এরকম পরিবারের সিজোফ্রেনিক রোগীদের সহজে রোগের লক্ষণ কমেনা।

চিকিৎসা ঃ সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় বর্তমানে বেশ কিছু আধুনিক ঔষধ ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ঔষধ নিয়মিত ব্যবহারে রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এক্ষেত্রে রোগটিকে ডায়াবেটিসের সাথে তুলনা করা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সিজোফ্রেনিয়া যাদের হয় তাদের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ রোগী চিকিৎসার পর সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যান। আর শতকরা ৫০ ভাগ রোগী ঔষধ ব্যাবহারের মাধ্যমে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন এবং বাকি শতকরা ২৫ ভাগ রোগী কখনোই ভালো হননা। তবে কোন রোগী কোন ভাগে পরবেন, অর্থাৎ রোগী সম্পূর্ণ ভালো হবেন কি হবেননা তা আগেই বলা সম্ভব নয়। তাই সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি হচ্ছে চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতো চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া। কারণ নিয়মিত ঔষধ নিয়ে, কতগুলো মনোবৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ করে এবং কতগুলো উপদেশ মেনে চললে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসার বিষয়ে নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

১. নিয়মিত ঔষধ গ্রহণঃ সুস্থ থাকতে হলে সিজোফ্রেনিয়ার রোগীকে নিয়মিত ঔষধ নিতে হবে। নিয়মিত ঔষধ ব্যবহার করলে তিনটি উপকার হয়ঃ

- রোগের লক্ষণগুলো কমে যায়।
- লক্ষণগুলো নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং
- রোগটি আবার হবার সম্ভাবনা কমে যায়।

২. ঔষধ কতদিন ব্যবহার করবেন?

এই রোগী কতদিন ঔষধ ব্যবহার করবেন তা সঠিকভাবে বলতে পারেন কেবলমাত্র একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা সাইকিয়াট্রিষ্ট। তাই তিনিই শুধুমাত্র ঔষধ বন্ধ করতে পারেন। এক গবেষণায় দেখা গেছে সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের ২০% রোগী চিকিৎসার পর নিরাপদেই ঔষধ বন্ধ করতে পারেন। তবে কারা এই সৌভাগ্যবান তা ঠিক করার কোন উপায় নেই। কাজেই নিজ থেকে ঔষধ বন্ধ করা উচিত নয়।

৩. ঔষধ না খেলে কি ক্ষতি হবে?

সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে আলোচনা না করে তার পরামর্শ ব্যতিত ঔষধ বন্ধ করলে সিজোফ্রেনিয়া আবার হবার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ রোগটি ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে। ১৯৯০ সালে এক গবেষণায় দেখা যায়, ঔষধ শুরুর পাঁচ বছর পরও যদি ঔষধ বন্ধ করে দেয়া হয় তবে সিজোফ্রেনিয়া হয়েছিল এমন ৮০% রোগীর ক্ষেত্রে পুনরায় রোগটি হয়। অর্থাৎ, ঔষধ বন্ধ করে দিলে রোগীর মধ্যে রোগটি পুনরায় এবং আগের চেয়ে তীব্র মাত্রায় ফিরে আসে বা ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়।সাধারণতঃ দেখা যায় যে রোগটি দ্বিতীয় বার ফিরে আসলে এর লক্ষণ দূর করতে প্রথমবারের চাইতে বেশী সময় লাগে এবং এই বারের চিকিৎসায় তীব্র মাত্রায় ঔষধ ব্যবহারেরও প্রয়োজন হয়। তাই নিজে নিজে বা আত্মীয়-বন্ধুদের কথায় সিদ্ধান্ড় না নিয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে ঔষধের ব্যপারে সিদ্ধান্ড় নেয়া জর"রী। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে সারা জীবন ঔষধ ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। বাকীদের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন লক্ষণ মুক্ত থাকার পরে এক পর্যায়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা সাইকিয়াট্রিস্ট ঔষধ বন্ধ করে দেন।

৪. নিজে নিজে ঔষধ বন্ধ করার কারণ কি?

অনেক সময় রোগী বা তার পরিবারের সদস্যরা নিজে থেকেই ঔষধ বন্ধ করে দেন। এর কতগুলো কারণ রয়েছে। যেমনঃ

- ঔষধ খেলে রোগের লক্ষণ কমে যায়। একবার যদি লক্ষণগুলো কমে যায়, তখন প্রায়ই রোগীরা ঔষধ ব্যবহার করা বন্ধ করেন। অথবা প্রায়ই ঔষধ খেতে ভুলে যান। বিশেষতঃ ঔষধ খাওয়ার সময় যদি এমন হয় যে, তা রোগীর দৈনন্দিন কাজের সাথে মেলানো কঠিন তবে ঔষধ না খাওয়ার ঘটনা বেশি ঘটে। সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলো না থাকলে রোগীর প্রায়ই মনে হয় যে, তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন এবং তার ঔষধ খাওয়ার দরকার নেই।
- অনেকেই মানসিক রোগের ঔষধ খাওয়াটা লজ্জাকর এবং অতীতে যে রোগ ছিল তার

স্মরণ চিহ্ন হিসাবে মনে করেন। অনেকে মনে করেন যে, ঔষধ ব্যবহারের কারণে তিনি শেষ হয়ে যাচ্ছেন। অনেকে ঔষধের উপর নির্ভরশীলতাকে লজ্জাজনক বা একধরণের অক্ষমতার চিহ্ন মনে করে ঔষধ ব্যবহার বন্ধ করে দেন। ধর্মীয় বা নৈতিক কারণেও অনেকে ঔষধ নিয়মিত গ্রহণ করেননা। অনেকে সৃষ্টিকর্তার উপর আস্থা রেখে ঔষধ ব্যবহার ছেড়ে দেন।

- সিজোফ্রেনিয়ার ঔষধ ব্যবহারের ফলে বেশ কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, মুখ বাকা হয়ে যাওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা, এক জায়গায় বেশিক্ষণ স্থির হয়ে বসতে না পাড়া, কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়া ইত্যাদি। এই ঔষধ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করে অনেকে ঔষধ ব্যবহার ছেড়ে দেন।
- সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের নিজেদের অসুস্থতা সম্পর্কে ধারণা থাকেনা। এর ফলে তারা নিজেদের সমস্যা বুঝেননা এবং ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেননা।
- প্রায়ই ওষধের দাম এত বেশি হয় যে, দীর্ঘদিন ঔষধ কেনার সামর্থ্যই অনেকের থাকেন্া।

সাইকোথেরাপী ও পূনর্বাসন ঃ উন্নত বিশ্বে সিজোফ্রেনিয়ার মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে ‘কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি’ নামক একধরণের সাইকোথেরাপির ব্যবহার হচ্ছে। সিজোফ্রেনিয়ার রোগ দীর্ঘমেয়াদী এবং অনেক সময় রোগটি পুরোপুরি নাও সারতে পারে। কাজেই অসুখ সত্ত্বেও কিভাবে সমাজে সুন্দর ভাবে বসবাস করা যায় তা রোগীকে শেখানো বিশেষ ভাবে জরুরী। এজন্য রোগীকে পেশাগত দক্ষতা প্রশিক্ষণ, সমাজে চলার দক্ষতা প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া বিশেষ ভাবে জরুরী। এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে বলে পূনর্বাসন। আমাদের দেশে এধরণের উদ্যোগগুলো ব্যপক ভাবে করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন।

ঔষধগুলোর কি ধরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়? এ রোগের চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ ব্যবহার করা হয়। এগুলো বেশ কয়েক রকমের হয় এবং বাজারে বিভিন্ন নামে এগুলো প্রচলিত আছে। এই ঔষধগুলো মুখে বা ইঞ্জেকশনের সাহায্যে নেয়া হয়। এই ঔষধ গুলো ব্যবহারের ফলে ব্যক্তির মধ্যে কতগুলো অনাকাঙ্খিত লক্ষণ দেখা দেয়। তবে এ লক্ষণগুলোর সব গুলোই একই ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়না। এক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। তবে এ লক্ষণ গুলো নিয়ে তেমন ভয় পাবার কারণ নেই। কেননা এগুলো সচরাচর স্থায়ী ক্ষতি করেনা। লক্ষণগুলো দেখা দেবার সাথে সাথে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট এর সাথে পরামর্শ করা উচিত। নিচে এই লক্ষণগুলোর বিষয়ে সংক্ষেপে দেয়া হলো।

- জিহ্বা বাইরের দিকে বেরিয়ে আসা, মুখ বাকা হয়ে যাওয়া, এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে না পারা বা বেশি নড়াচড়া করা, ভাববিহীন মুখভঙ্গি, হাটার সময় হাত না নাড়ানো, একদম স্থির হয়ে থাকা, শরীরে কাঁপুনি হওয়া, কখনো কখনো শারীরিক রোগের লক্ষণ দেখা যাওয়া, কোন খাবার মুখে না থাকা সত্ত্বেও চোষা এবং চিবানোর মতো করে মুখ নড়ানো। এই লক্ষণগুলো দেখা দিলে একটুও দেরি না করে মানসিক রোগের ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন।
- ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্যপাত বন্ধ হয়ে যাওয়া।
- মুখ ও গলা শুকিয়ে যাওয়া, ঘাম কমে যাওয়া, প্রস্রাব কমে যাওয়া, এমনকি প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, চোখে ঝাপসা দেখা, হৃৎপিন্ডের জটিলতা, ওজন বেড়ে যাওয়া, শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়া, চোখে আলো সহ্য না হওয়া ইত্যাদি।
- অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধের প্রভাবে মেয়েদের বুকে দুধ আসতে পারে। এটি ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। এতে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু বিশেষতঃ কুমারী মেয়েদের ক্ষেত্রে আমাদের সামাজিক পরিস্থিতিতে এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফল মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির কোন স্থান নেই। মনে রাখতে হবে, এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াটি কোন স্থায়ী ক্ষতি করেনা।

- অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে মেয়েদের মাসিকের সমস্যা হতে পারে।

ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি হয় নানা কারণে। ডাক্তাররা এধরণের সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বন্ধ করার জন্য সাথে অন্য ঔষধ দিয়ে দেন। কিন্তু রোগী হয়তো অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ ঠিকই খেলেন, কিন্তু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী ঔষধ খেলেননা। তাহলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। কখনো কখনো দেখা যায় যে, সিজোফ্রেনিয়ার রোগীরা ঔষধ খেতে রাজি হননা। কিন্তু তাদের জন্য ঔষধ নিতান্তই দরকার। উপায় না দেখে ডাক্তাররা দীর্ঘদিন কাজ করে এমন ধরণের অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ ইঞ্জেকশন আকারে দেন। এছাড়া কিছু রোগীর ক্ষেত্রে তারা ঔষধ খেতে রাজি থাকলেও চিকিৎসার প্রয়োজনে তাদের ইঞ্জেকশন দিতে হয়। এধরণের ইঞ্জেকশন দেয়া হলে এই ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য সাথে অন্য ঔষধ দেয়া হয়। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় রোগীরা ঐ ঔষধ খাননা। অনেক গরীব রোগী টাকার অভাবে ঔষধ কিনতে না পেরে ঔষধ বন্ধ করে দেন। অনেকে অবহেলা করে বা সচেতনতার অভাবে ঔষধ বন্ধ করে দেন। ফলে উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন ধরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, উপরের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণে সময়োচিত পদক্ষেপ নিলে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা যায় এবং সচরাচর এগুলো কোন স্থায়ী ক্ষতি করেনা। সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে যোগাযোগ করলে তিনিই এগুলো সমাধানের ব্যবস্থা করবেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঔষধ ব্যবহার না করলে রোগীর সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলো বেড়ে যেতে পারে এবং ফলে তার বাস্তব জ্ঞান সম্পূর্ণ হারিয়ে যেতে পারে। কাজেই ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ক্ষতির থেকে ঔষধ বন্ধ করে দেয়ার ক্ষতি তখন অনেক বড় হয়ে উঠে। কাজেই নিয়মিত ঔষধ ব্যবহার রোগের চিকিৎসার জন্য একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ।

ঔষধ কতদিন চলবে? অনেক রোগীকেই দীর্ঘ দিন ধরে ঔষধ ব্যবহার করতে হয়। যতদিন মানসিক রোগের ডাক্তার ঔষধ বন্ধ না করছেন ততদিনই ঔষধ চলবে। কোন অবস্থায়ই ডাক্তার

ব্যতিত অন্য কেউ ঔষধ বন্ধ করতে পারবেননা।

ঔষধে শরীর মোটা হয়ে যায় কিনা? মোটা হলে কি করা যাবে? অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু মানসিক রোগের ঔষধ শরীর মোটা করতে পারে। শরীর মোটা হলে ডাক্তারের সাথে কথা বলুন। তিনিই উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। তবে নিয়মিত হাটা, হালকা শরীর চর্চা করা এবং ডাক্তারের পরামর্শ মতো খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা অনেকটা সাহায্য করতে পারে।

গর্ভধারণের ক্ষেত্রে ঔষধ গ্রহণের নিষেধ আছে কিনা? গর্ভধারণের সময়ে অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ ব্যবহার ভ্রমণের জন্য বিশেষ বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। রোগী যদি গর্ভবতী হন তবে তা ডাক্তারকে জানানো বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। এরপর ডাক্তারই উপযুক্ত পরামর্শ দিবেন।

ঔষধের প্রভাবে মেয়েদের গোফ উঠতে পারে কিনা? তাদের মাসিক অনিয়মিত হয়ে যেতে পারে কিনা? অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে হরমোনের অস্বাভাবিকতা তৈরি হতে পারে। এরফলে মেয়েদের গোফ উঠতে পারে। মেয়েদের মাসিকের অনিয়ম হতে দেখা যায়। এছাড়া এই ধরণের ঔষধের প্রভাবে অনেক সময় মেয়েদের বুকে দুধ চলে আসে। বিশেষতঃ অবিবাহিত মেয়েদের এই ধরণের লক্ষণের কারণে অনেক সামাজিক সমস্যা পোহাতে হতে পারে। এটিও ঘটে ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণে। এধরণের সমস্যা গুলো হলে আপনার ডাক্তারকে জানান। তিনিই পরামর্শ দিবেন। লক্ষ্য রাখবেন, এই অসুবিধা গুলো ডাক্তার সমাধান করতে পারবেন। কাজেই ভয়ের কারণ নেই।

সিজোফ্রেনিয়া হলে কি ধরণের খাবার খেতে হবে? এই রোগ হলে সব ধরণের খাবারই খাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কোন ধরণের বাছবিচার নেই।

ঔষধ তিতা লাগলে কি করা যায়? ঔষধ একটু তিতা লাগলে সহ্য করে খেতে হবে। তিতা লাগার চেয়ে অসুখ বেড়ে যাওয়ার বিপদটা বেশি মারাত্মক। ট্যাবলেট খাপ থেকে খুলে কিছুক্ষণ হাতে রেখে তারপর খেলে তবে ঔষধের গন্ধ কিছুটা কমে। কাজেই এভাবে খেয়ে দেখতে পারেন।

ঔষধ খাওয়ালে হাত-পা কাঁপে কেন? এটি অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধের একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যাতে তৈরি না হয় সেজন্য সচরাচর ডাক্তাররা আরেকটি গোত্রের ঔষধ দেন যা এই শরীর কাঁপানো বন্ধ করে। যদি ভুলক্রমে কেউ ঐ ঔষধটি না খান তবে তার এই অসুবিধা হতে পারে। অথবা ঐ ঔষধটি হয়তো পর্যাপ্ত পরিমাণে বা মাত্রায় দেয়া হয়নি। যদি এভাবে হাত-পা কাঁপে তাহলে ভয়ের কিছু নেই। এটি দেখা দিলে আপনার ডাক্তারের (সাইকিয়াট্রিস্টের) সাথে যোগাযোগ করলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি এটি নিয়ন্ত্রণ করে দেবেন।

অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ গ্রহণকালে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো চলে কিনা? মা যদি অ্যন্টি-সাইকোটিক ঔষধ খান এবং তার বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান তবে দুধের মাধ্যমে বাচ্চার শরীরে এই ঔষধ গিয়ে প্রতিক্রিয়া করতে পারে। কাজেই আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ঔষধ কেনার টাকা না থাকলে কি করতে হবে? আমাদের দেশের অনেক মানুষই অর্থকষ্টে ভুগেন। কিন্তু একবার কারো সিজোফ্রেনিয়া হলে তাকে বহু বছর ধরে ঔষধ খেতে হয়। ঔষধ না খেলে অসুখ বেড়ে যায়। কাজেই রোগীদের পরিবার গুলো বিপদে পড়েন। এসমস্যার সমাধান কষ্টকর। সরকারি হাসপাতালে স্বল্প খরচে চিকিৎসা পাওয়া যায়। গরীব রোগীদের বিনা পয়সায় ভর্তি রাখার ব্যাবস্থা আছে। এছাড়া সরকারের টাকায় অল্প কিছু ঔষধ বিনা মূল্যেও দেয়া হয়। কিন্তু তারপরও বলতেই হবে এসুযোগ খুবই কম। যতটুকু সুযোগ আছে তা ব্যবহারের

পাশাপাশি যত কষ্ট করেই হোকনা কেন টাকা যোগাড় করতেই হবে। কেননা ঔষধ না খেলেই রোগ বেড়ে যাবে।

কি কারণে রোগটি আবার হতে পারে?

- ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কেউ ঔষধ খাওয়া বন্ধ করে দিলে রোগটি আবার হতে পারে।
- ঔষধ ব্যবহারের মাত্রা নিজের খেয়াল খুশি মতো কমিয়ে-বাড়িয়ে দিলেও সমস্যা হতে পারে।
- নিয়মিত ডাক্তারের সাথে পরামর্শ না করলে এবং অনিয়মিত ঔষধ খেলেও রোগটি আবার হতে পারে। এছাড়া দীর্ঘদিন ডাক্তারের পরামর্শ না নিলে এবং পুরাতন মাত্রায় ঔষধ খাওয়ালেও সমস্যা হতে পারে। কেননা, সময় সময় রোগীর ঔষধ বাড়াতে বা কমাতে হয়। এরকম ক্ষেত্রে রোগটি আবার হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
- রোগীকে খোঁচা দিয়ে কথা বলা, তার আচার-আচরণ নিয়ে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করা।
- রোগীর অবাধ্যতার জন্য বা কাজ-কর্মে অনীহার জন্য তাকে বকা-ঝকা করা।
- রোগীর বর্তমান অবস্থার জন্য তাকে দায়ী করলে বা তার অবস্থার জন্য তার সমানে কান্নাকাটি করা।
- রোগীর সামনে অন্যেরা ঝগড়া-ঝাটি করা, মারা-মারি করা।
- রোগীকে নির্জন ঘরে একা একা রাখা, লোক সমাজে মিশতে না দেয়া বা মিশতে উৎসাহিত না করা।
- বাড়ির ছোট-খাটো কাজেও রোগীকে না ডাকা।
- পরিবারে কোন দূর্ঘটনা (যেমন, কারো বিবাহ বিচ্ছেদ, পরিবারে ভাঙন, কেউ কঠিন অসুখে আক্রান্ত হওয়া, কারো মৃত্যু হওয়া ইত্যাদি)।
- খারাপ পরিবেশে (যেমন, খুব গরম, খুব শীত, অত্যন্ড় কোলাহল, ভীড় বা একদম

নিঃস্বন্দ পরিবেশ) রোগীকে দীর্ঘ সময় রাখা।

- রোগীর সহ্য ক্ষমতার থেকে বেশী শারিরীক এবং মানসিক পরিশ্রম তাকে দিয়ে করানো।
- একই ধরণের মানসিক সমস্যায় ভুগছে এরকম কারো সাথে রোগীকে থাকতে দিলে।
- রোগীর যত্নগ্রহণকারী রোগীর উপর প্রায়ই বিরক্তি প্রকাশ করলে অথবা রাগ করলে।
- রোগের লক্ষণগুলো পুনরায় দেখা দিতে থাকা সত্বেও তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে না যাওয়া।
- ডাক্তারের চিকিৎসার পরিবর্তে কবিরাজি বা অন্য কোন ধরণের আধ্যাত্মিক চিকিৎসা শুরু করা।
- রোগীকে বেদম প্রহার করা ও তাকে বেধে রাখা।
- রোগী জীবনে চলার মতো দক্ষতা অর্জন না করা সত্ত্বেও তাকে বিবাহ দিয়ে দেয়া। বিশেষতঃ যদি অপর পক্ষকে রোগীর মানসিক অসুখের বিষয়ে না জানিয়েই বিবাহ দেয়া হয় তবে রোগীর অসুখ পুনরায় দেখা দিতে পারে।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীর আত্মীয়রা সাধারণতঃ সিজোফ্রেনিয়ার বিষয়ে কতগুলো প্রশ্ন প্রায়শই করে থাকেন। নিচে এগুলো উলে- খ করা হলো ঃ

সিজোফ্রেনিয়ার রোগী কেন একা একা কথা বলে? চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং ত্বক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ তার পরিবেশ থেকে তথ্য গ্রহণ করে এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করে। কারো সিজোফ্রেনিয়া হলে তার পরিবেশ হতে তথ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা বাস্তবে ঘটেনি এমন অনেক কিছুই দেখে, শোনে বা অনুভব করে, বিশ্বাস করে এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করে। অনেক সময় দেখা যায় রোগী একা একা কথা বলছে। রোগী এসময় গায়েবী ভাবে কাউকে দেখছে এবং তার সাথে কথা বলছে। এক্ষেত্রে রোগী একাই কাউকে বা

কিছুকে দেখছে এবং শুনছে। পাশের কেউ দেখছেনা বা শুনছেনা। পুরোটাই রোগীর ভূল। এই দেখা বা শোনা যে ভুল, রোগী তাও বুঝতে পারছেনা। ফলে রোগী কথোপকথোন চালিয়ে যায়। অন্যান্য মানুষের কাছে পুরো বিষয়টাই অত্যন্ড় অদ্ভূত ঠেকে।

রোগীকে কি ধরণের খাবার খাওয়ানো উচিত? রোগী সাধারণ সবধরণের খাবারই খেতে পারে। যদি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ খাবার ক্ষেত্রে কোন ধরণের নিষেধ থাকে তবে ডাক্তার সে বিষয়ে বলে দিবেন। সিজোফ্রেনিয়ার কোন কোন রোগীর নিজের যত্ন নেয়ার প্রবণতা কমে যায় এবং তিনি নিজের উদ্যোগে সময় মতো খাবার নাও খেতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি অপুষ্টির শিকার হবেন। রোগীর আত্মীয়দেরই দায়িত্ব রোগী যাতে নিয়মিত ও পরিমাণ মতো পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করেন তা নিশ্চিত করা। রোগ বেড়ে গেলে কখনো কখনো রোগী হয়তো সম্পূর্ণ ভাবে খাবার গ্রহণ করা বন্ধ করে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে তাকে জরুরী ভিত্তিতে মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। অনেক সময় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হতে পারে।

কোন ধরণের ব্যয়াম রোগীকে সাহায্য করতে পারে কি? নিয়মিত ব্যয়াম রোগীর দেহ ও মন সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে। তবে ব্যয়ামটা হালকা হতে হবে। যেমন, প্রতিদিন কিছু পরিমাণে হাটা। অধিক শ্রম সাধ্য শরীর চর্চা অসুখকে বাড়িয়ে দিতে পারে। রোগী তার শরীরের উপর অধিক চাপ নিবেননা।যে ব্যয়ামটা বেশী কষ্টসাধ্য মনে হবে সেটি করবেননা।

কি পরিমাণে ঘুম রোগীর জন্য ভালো? যে পরিমাণ ঘুমালে রোগী নিজে ভালো বোধ করেন তাই তার জন্য যথার্থ। একজন সাধারণ সুস্থ মানুষ সাধারণতঃ ছয় থেকে আট ঘন্টা ঘুমান। রোগী যদি এর থেকেও কিছু বেশী বা কম ঘুমিয়ে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন তবে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি মাত্রাতিরিক্ত কম বা বেশী ঘুমান তবে বিষয়টি নিয়ে ডাক্তারের সাথে আলোচনা করা দরকার। কোন কোন রোগী এতো বেশী ঘুমান যে, খুব সামান্য পরিমাণ সময়ই জেগে থাকেন। যতক্ষণ জেগে

থাকেন তাও বিছানায় শুয়ে কাটাতেই পছন্দ করেন। এমনটা অসুখের কারণে বা মাত্রাতিরিক্ত ঔষধ ব্যবহারের ফলে হতে পারে। ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়াটা এক্ষেত্রে বিশেষ জরুরী। আবার রোগী অতিরিক্ত কম ঘুমিয়েও খুব সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, এক্ষেত্রে বিষয়টা স্বাভাবিক না অসুখ বেড়ে যাবার ফলে হয়েছে তা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

কি কি দৈনন্দিন কার্যকলাপ রোগীকে সাহায্য করতে পারে? সাধারণ মানুষের জীবনে যে ধরণের নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকে তেমন নিয়ম শৃঙ্খলা রোগীর জীবনেও থাকতে হবে। তবে এই শৃঙ্খলা কিছু পরিমাণে স্থিতিস্থাপক হতে হবে। এমন ধরণের র"টিন হতে হবে যা রোগীকে অলস করে ফেলবেনা আবার অতিরিক্ত চাপেও ফেলবেনা। রোগীর সহ্যের, প্রয়োজনের এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে এধরণের রুটিন বানানো প্রয়োজন।

কি কি বিনোদন রোগীর জন্য ভালো? সাধারণ মানুষ যে সব বিনোদনে অভ্যস্ড় রোগীর জন্যও তাই প্রয়োজন। তবে বিনোদন হতে হবে রোগীর পছন্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, বেড়াতে যাওয়া, সিনেমা দেখা, থিয়েটার দেখা, গান শোনা, পছন্দের খাবার খাওয়া, গল্পের বই পড়া, বাগান করা ইত্যাদি। রোগীর অসুখের পর্যায়ের দিকে খেয়াল রেখে বিনোদন বাছাই করা প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে বিনোদন আবার রোগীর জন্য চাপ হয়ে না উঠে। যেমন, কোন কোন রোগী উচ্চ শব্দ সহ্য করতে পারেননা। তাকে যদি ব্যান্ড সঙ্গীত অনুষ্ঠানে নেয়া হয় তবে হীতে বিপরীত হতে পারে। একই ভাবে যে সব রোগী ভয় পান তাদেরকে ভয়ের সিনেমা দেখালেও একই ক্ষতি হতে পারে।

বিয়ে দিলে মানসিক রোগ ভালো হয়ে যায় কিনা?

অনেক অনেক দিন ধরেই আমাদের দেশের মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে যে বিয়ে দিলে মানসিক রোগ ভালো হয়ে যায়। ফলে কারো মানসিক অসুখ হলেই আশে-পাশের মানুষেরা রোগীকে বিয়ে দেয়ার পরামর্শ দেন। অনেকে যুক্তি দেখান যে, স্ত্রী বা স্বামী রোগীর আরো ভালে যত্ন নিতে পারবেন।

অনেক সময় রোগী নিজেও তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করেন। কোন কোন রোগী বলেন যে বিয়ে দিলে তার রোগ ভালো হয়ে যাবে। অনেক সময় পূর্ণ বয়স্ক রোগী যৌন আগ্রহ প্রকাশ পায় এমন ধরণের আচরণ করেন। অনেক সময় রোগীর যত্নগ্রহণকারী ভবিষ্যতে তার অবর্তমানে রোগীকে কে দেখা শুনা করবে সেটা ভেবে খুবই ভীত থাকেন। এজন্য রোগ কিছুটা কম থাকা অবস্থায় বিয়ে আয়োজন করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিয়ের আগে অন্য পক্ষকে বিষয়টা বলা হয়না। মনে করা হয়, একবার বিয়ে হয়ে গেলে স্ত্রী বা স্বামী সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখবে এমন সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু বিয়ের পরই সমস্যা শুরু হয়ে যায়। লুকিয়ে লুকিয়ে দীর্ঘদিন ঔষধ খাওয়া সম্ভব নয়। ফলে ঔষধ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অসুখ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। অনেকক্ষেত্রেই রোগীকে ঔষধ খেতে দেখার পর এটা কোন রোগের ঔষধ তা জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন জানাজানি হয়ে যায়। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন এরাও অসুখের বিষয়টি বলে দিতে পারেন। জানা জানির পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিয়ে ভেঙে যায়। তখন রোগী মনে আঘাত পেয়ে পুনরায় অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন। বিয়ে করার পর অনেক ধরণের দায়িত্ব নিতে হয়। যেমন, শ্বশুর বাড়ির সাথে খাপ খাওয়ানো, বাজার করা, রান্না করা, রুজি করা, স্বামী স্ত্রী একে অপরের সাথে খাপ খাওয়ানো ইত্যাদি। কিন্তু সিজোফ্রেনিয়ার রোগীরা সচরাচর এসমস্ত বিষয়গুলোর চাপ সহ্য করতে পারেননা। অসুখের কারণেই তাদের বৈশিষ্ট্য এমন ধরণের হয় যে, আশেপাশের মানুষেরা তাদের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে অসুবিধা বোধ করেন। কাজেই রোগীরা এতো ধরণের সমস্যার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে ব্যার্থ হন, যার ফলে তাদের মনের উপর চাপ পড়ে এবং তারা অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন। এছাড়া আরেকটি সমস্যা হলো সিজোফ্রেনিয়া বংশে ছড়ায়। রোগীর সন্তানদের মধ্যে এই রোগটি হবার সম্ভাবনা শতকরা দশ থেকে পনেরো ভাগ। আর যদি এমন হয় যে, রোগীর সাথে যার বিয়ে হলো তারও এই রোগ আছে তাহলে তাদের সন্তানের মধ্যে এরোগ হবার সম্ভাবনা শতকরা প্রায় চলি-শ ভাগ। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, রোগীকে বিয়ে দিলে ভালোর থেকে মন্দ হবার সম্ভাবনাই বেশি। তবে যদি রোগীর রোগ বেশ কম থাকে, তিনি সমাজে চলা-ফেরার মতো দক্ষতার অধিকারি হন, এবং যার সাথে বিয়ে দেয়া হচ্ছে তিনি এবং তার পরিবার-বর্গ রোগীর রোগ সম্পর্কে ভালো ভাবে জানেন তবে এধরণের বিয়ে রোগীর জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠে। কেননা যত্ন ও ভালোবাসা

সিজোফ্রেনিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে খুবই সহায়ক। তবে এধরণের বিয়ের আগে সম্ভব হলে একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে নেয়া একটি উত্তম পন্থা।

রোগীর সাথে কি রকম ব্যবহার করা উচিত? সিজোফ্রেনিয়া রোগীর দরকার স্নেহ-মমতা এবং আদর ভালোবাসা। কাজেই নিয়মিত চিকিৎসা নিশ্চিত করা, যত্ন নেয়া এবং ভালো ব্যবহার তাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। তাদেরকে পাগল বলা যাবেনা। তাদেরকে মানুষের মর্যাদা দিতে হবে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেও যতটুকু সম্ভব তাদেরকে সক্রিয় করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, রোগীদের অনেকেই উৎকণ্ঠা সহ্য করতে পারেননা। কাজেই তাদেরকে অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা তৈরি করার মতো বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত না করাই ভালো। পরিবারের ও সমাজের সক্রিয় সমর্থন তাদের জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন।

রোগী উত্তেজিত হয়ে উঠলে কি করা উচিত? অসুখ বেড়ে গেলে কোন কোন রোগী উত্তেজিত হয়ে উঠেন, মানুষকে বকাবকি করেন এবং এমনকি মারও লাগান। এমনকি মা-বাবাও মানেননা। কখনো বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চেষ্টা করতে পারেন। আবার কেউ কেউ অদ্ভূত সব আচরণ করতে পারেন। যেমন, সবার হাতে পায়ে ধরে সালাম করে মাপ চাইতে থাকা ইত্যাদি। এসকল ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো উপায় হলো রোগীকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়া। রোগী যদি আসতে না চায় তবে তাকে জোর করে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে। তবে তাকে মার-ধোর করা যাবেনা। মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা নিলে রোগীর বোধ জ্ঞান ফিরবে। তখন জোর করে ভর্তি করিয়ে দেয়ার জন্য আত্মীয়-স্বজনদের উপর তার যে রাগ তা আর থাকবেনা। যদি হাসপাতালে ভর্তি করানো না যায় তবে অন্ড়তঃ মানসিক রোগের ডাক্তার বা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে আসতেই হবে। তখন ডাক্তার ঔষধ দিয়ে রোগ কমানোর ব্যবস্থা করবেন। রোগ কমে গেলে রোগীর উত্তেজনাও কমে যাবে। যদি ডাক্তার থেকে অনেক দূরে থাকেন তবে অন্ড়তঃ ডাক্তারের সাথে ফোনে কথা বলে দেখতে পারেন। যদি রোগীকে হাসপাতালে আনতে দুই একদিন দেরি হয় তবে তাকে বাড়িতে

নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সে যাতে কারো ক্ষতি না করতে পারে আবার নিজেরও ক্ষতি না করতে পারে নিশ্চিত করতে হবে। এবং অবিলম্বে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হবে।

রোগী যদি কোন কিছু না করে চুপ করে বসে থাকে তবে কি করতে হবে? সিজোফ্রেনিয়ার রোগী অনেক সময় নিজেকে গুটিয়ে নেন। চুপ-চাপ বসে থাকেন। না বললে নিজে থেকে খাবার খাননা, গোসল করেননা, দাঁত মাজেননা, কাপড় বদলাননা, হাটা-চলা করেননা, আত্মীয়দের সাথে কথা বলেননা- এক কথায় জড় বস্তুর মতো হয়ে যান। এরকম অবস্থায় তাদের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। অসুখের উন্নতি হলে তাদের এরকম গুটানো স্বভাবও থাকবেনা। এছাড়া আত্মীয়দের কাজ হবে বলে কয়ে, রোগীকে দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়মিত করানো। রোগীকে একেবারে গুটিয়ে যেতে না দেয়া। আদর করে, বুঝিয়ে, স্নেহ দিয়ে, প্রশংসা করে রোগীকে দিয়ে দৈনন্দিন কাজগুলো করানো।

রোগী যদি বলা সত্ত্বেও কাজকর্মে সক্রিয় না হন তবে কি ব্যবস্থা নেয়া উচিত? রোগীকে স্নেহ ভালোবাসার সাথে বুঝিয়ে শুনিয়ে কাজ-কর্মে সক্রিয় করার চেষ্টা করা উচিত। যদি তাতেও কাজ না হয় তবে শারীরিক ভাবে তাকে সাহায্য করা যেতে পারে। অর্থাৎ তাকে হাতে ধরিয়ে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে তার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একেক জনের ক্ষেত্রে একেক ধরণের পুরস্কার ফলপ্রসু হতে পারে। কাউকে কাউকে মনোযোগ দিলে ও প্রশংসা করলেই সে খুশি হয়ে কাজটি করার চেষ্টা করতে পারে। আবার অনেককে পুরস্কার হিসাবে পছন্দের খাবার, বিভিন্ন ধরণের উপহার, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া বা তার পছন্দনীয় কিছু করার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

রোগী কি কখনো কাজ-কর্ম করে খেতে পারবে? সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ কমলে রোগী অবশ্যই কাজ করতে পারবেন। তারা ঘরের কাজ-কর্ম করতে পারেন। বাজার করা, বিল পরিশোধ করা, দোকানে

গিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা ইত্যাদি দায়ীত্ব নিতে পারেন। এছাড়া ঘরের বাইরেও চাকুরি করতে পারেন। তবে তখন তাকে কারো তত্বাবধানে থেকে কাজ-কর্ম করতে হবে। খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে রোগী নিজ দায়িত্বে চাকুরী করতে বা ব্যাবসা করতে পেরেছেন। রোগীর ক্ষেত্রে এমন ধরণের কাজ ভালো হবে যাতে খুব বেশী মাথা খাটাতে হয়না। রোগীর যাতে খুব বেশি পরিশ্রম না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগী যখন খারাপ অনুভব করবেন তখন যাতে তিনি বিশ্রাম নিতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে অসুখ বেড়ে যেতে পারে। রোগী যদি কোন কাজ নিয়ে কিছুটা ব্যাস্ত থাকেন তবে তা তার সুস্থ থাকার জন্য ভালো। মধ্যম পন্থাই উত্তম পন্থা। একেবারে কিছু না করাও রোগীর জন্য খারাপ, আবার অতিরিক্ত পরিশ্রমও তার জন্য ক্ষতিকর।

অসুস্থ রোগীকে বেশি দায়িত্ব দেয়া উচিত কিনা? রোগীর রোগটি কম থাকলে তাকে দায়িত্বশীল আচরণে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। কিন্তু রোগীকে ততটুকু দায়িত্বই দেয়া উচিত যতটুকু করলে রোগীর উপর কোন চাপ না পড়ে। বেশি চাপ পড়া রোগীর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ। এতে করে রোগটি পুনরায় হতে পারে।

রোগীর লেখাপড়া হবে কিনা? যে কাজে অনেক বেশি মাথা খাটাতে হয় তা সিজোফ্রেনিয়ার রোগীর জন্য ভালো নয়। এজন্য এই রোগীদের পড়ার জন্য চাপ দেয়া উচিত নয়। মাথায় খুব বেশি চাপ না ফেলে যতটুকু পারা যায় ততটুকু পড়তে নিষেধ নেই। মনে রাখতে হবে অসুখ হবার পর খুব বেশি লেখাপড়া তাদের দিয়ে না হবারই কথা। তবে খুব কম ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কেউ কেউ বেশ কিছুটা লেখাপড়া করেছেন। তবে এটা হলো ব্যতিক্রম।

রোগটা ছোঁয়াচে কিনা? সিজোফ্রেনিয়া কোন ছোঁয়াচে রোগ নয়। রোগীর সাথে বসবাসকারী মানুষদের এই রোগ হবেনা। তবে এই রোগ বংশে ছড়ায়। অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরপুরুষদের মধ্যে, যেমন, বাবা-মায়ের থেকে এই রোগ সন্তানদের মধ্যে ছড়াতে পারে।

রোগীর বাচ্চা হবে কিনা? সিজোফ্রেনিয়া সন্ড্রন জন্মদানের পক্ষে কোন বাধা নয়। রোগীর বা রোগীর স্ত্রীর যদি অন্য কোন শারীরিক সমস্যা না থাকে তবে তারা সন্তান জন্ম দিতে পারবেন।

শেষ কথা

উপযুক্ত যত্ন পেলে সিজোফ্রেনিয়ার রোগীরা আর দশটা মানুষের মতোই সাধারণ জীবন-যাপন করতে পারেন। তবে তাদের জীবন হতে হবে শান্ড়িপূর্ণ। খুব ঝুট-ঝামেলায় না যাওয়াই ভালো। দেখা গেছে যে, শান্তিপূর্ণ ঢিলেঢালা জীবন তাদের জন্য ভালো। একারণে গ্রাম্য জীবন তাদের জন্য কল্যাণকর। আমাদের দেশে বেশির ভাগ মানুষই গ্রামে থাকে। তাই এদেশে সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের জীবন-যাপন করতেও সুবিধা হয়। আমাদের দেশে শক্ত পারিবারিক বন্ধন থাকায় সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের চিকিৎসায় তা বিশেষ সহায়ক হয়। এই ধরণের রোগের চিকিৎসায় দরকার রোগীর পরিবারের সদস্যদের সচেতনতা। এছাড়া সামগ্রিক ভাবে সামাজিক সচেতনতা রোগীর জন্য আশির্বাদ বয়ে আনে।

লেখকঃ হোসনে আরা বেগম, মনোবিজ্ঞানী, শামসুন্নাহার হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নোটঃ বর্তমান লেখাটি ‘মনভুবন’ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় ডিসেম্বর ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটির সম্পর্কে জানতে হলে বা কোন মতামত জানাতে হলে ই-মেইল করুন এই ঠিকানায় ঃ husnay_ara@yahoo.com (লেখক) অথাবা publication@bcps.org.bd |